ভারতের ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভূগোলঃ পরিসর, সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের জন্য অধরা অন্বেষণ

নাজিমা পারভিন

২১ নভেম্বর, ২০২২

বর্তমান ভারতে মুসলিম পরিচয় ও পরিসরের প্রতি প্রশাসনিক মনোভাবের প্রকৃতিকে জাহাঙ্গীরনগর (নতুন দিল্লি), খারগন (মধ্যপ্রদেশ) ও লখনৌ (উত্তর প্রদেশ)-এর "মুসলিম প্রধান" অঞ্চলের তথাকথিত অননুমোদিত সম্পত্তিগুলিকে সরকারী কর্তৃপক্ষের হাতে ধ্বংস হওয়ার ঘটনাগুলি স্পষ্ট করে তোলে। যদিও, সরকারী প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মুসলিম পরিসর সর্বদাই বিবাদের কারণ ছিল, কিন্তু এই নতুন বুলডোজারের রাজনীতি তুলনামূলকভাবে একটি নতুন ঘটনা।

একটি সমস্যাসঙ্কুল ক্ষেত্র হিসেবে মুসলিম পরিসরকে গুঢ়ভাবে পুনর্সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। "ছোট পাকিস্তান" এবং "সন্ত্রাসবাদীদের গুপ্ত আস্তানা"-র মত নতুন নতুন প্রতীক ও বুলি এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, যাতে মনে হয় যেন ধর্ম কোনও পরিসরের সীমানা নির্ধারণের একটি বৈধ উপায়। মুসলিম পরিসরকে *বিবাদের কেন্দ্র* হিসেবে চিহ্নিত করা, এক্ষেত্রে এমন একটি প্রক্রিয়াকে সামনে আনে, যার সাহায্যে ভারতের পরিসরটি সুস্পষ্টভাবে হিন্দু পরিভাষার প্রেক্ষিতে বিবেচিত হয়ে।

অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকই মন্তব্য করেছেন যে, ধর্মকে ভিত্তি করে স্থানিক সীমারেখার পুনর্সংজ্ঞায়নের ঘটনাটি, অনস্বীকার্যভাবে, ২০১৪ সালে বিজেপির সফলভাবে ক্ষমতায় আসার ফলশ্রুতি। আজান, নামাজ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্মীয় উৎসব, রাজনৈতিক আচরণ এবং যেকোন রকম সমষ্টিগত চর্চাকে যা চিত্রিত করে, সেগুলি সহ মুসলিম ধর্মের সমস্ত আচারই হিন্দুত্বের দাবীর আকস্মিক বিস্ফোরণ হিসেবে সংজ্ঞায়িত হচ্ছে। ধর্ম কিভাবে রাজনীতির সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী মানদণ্ড হয়ে উঠেছে তা যদিও এই সরলীকৃত সিদ্ধান্তটি ব্যাখ্যা করতে অক্ষম।

একটি সরকারী শ্রেণীবিভাগ হিসেবে ধর্মের এই উত্থানের একটি নিজস্ব ইতিহাস আছে, যা মূলধারার রাজনীতির চরিত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। সামাজিক ন্যায়বিচারের রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ধর্মনিরপেক্ষ কার্যাবলী, যা দেশভাগের পর থেকেই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক নির্দেশক বিন্দু হিসেবে কাজ করত, ১৯৮০-র দশকের শেষভাগ থেকেই ধীরে ধীরে তা একটি গভীরতর ধর্মীয় পরিচয়ভিত্তিক রাজনীতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনটি বিবর্তিত হয়ে একটি সংখ্যাগুরু-হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভাষার প্রতিষ্ঠা করেছে।

ধর্ম এবং নাগরিকতা

ধর্মকে একটি শ্রেণীবিভাগ হিসেবে প্রত্যাখ্যান করে, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে নাগরিকত্বের একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংজ্ঞা গ্রহণ করা সিদ্ধান্তটি, বিশেষ করে দেশভাগের সময়ের হিংস্রতার প্রেক্ষিতে, একটি বৈপ্লবিক পদক্ষেপ ছিল। তবে, পরবর্তীকালে, বিশেষ করে ১৯৮৫ সাল থেকে শুরু হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনগুলিতে ধর্মীয় পরিচয়কে নাগরিকত্বের কাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে।

২০০৪ সালের নাগরিকত্ব আইন থেকে দেখা যায় যে ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার শর্ত হিসেবে জন্মের গুরুত্ব কমিয়ে, বংশধারাভিত্তিক নীতিকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের আইনটিতে যুক্ত হওয়া উপধারা [৩(২)] স্পষ্টভাবে তুলে ধরে যে, একটি শিশুকে

জন্মগতভাবে ভারতের নাগরিক হিসেবে তখনই ধরা হবে, যখন "পিতামাতার মধ্যে একজন ভারতের নাগরিক এবং অন্যজন, শিশুর জন্মের সময়, অবৈধ অভিবাসী না হন"। এই আইনের ফলে, অবৈধ অভিবাসীরা নিবন্ধীকরণ বা রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব পাওয়ার অনুপযুক্ত হয়ে যান, এবং তাঁদের অবস্থান সঙ্কুচিত হয়ে তাঁরা রাষ্ট্রহীন জনগোষ্ঠীতে পরিণত হন।

এর পরবর্তী আইনটি, যা নাগরিকত্ব প্রতিষ্ঠার প্রায়োগিক দিকটিকে ব্যাখ্যা করে, সেটি সংখ্যালঘু শ্রেণীর *হিন্দু যাঁদের পাকিস্তানের নাগরিকত্ব আছে* তাঁদের অবৈধ অভিবাসীর সংজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দেয়। এই ব্যাখ্যাটি, পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশী অভিবাসী, বিশেষ করে মুসলিমদের পরিচয়কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে। অবৈধ অভিবাসীদের কারাবাস ও বিতাড়নের মধ্যে দিয়ে অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনটি সরকারের হাতে একটি বিশেষ ক্ষমতাও তুলে দেয়। এই ক্ষমতার বলে, আইনটির সংশোধনের পরেই, সরকার একটি জাতীয় নাগরিকত্ব নিবন্ধন বা ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনশিপ এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধন বা ন্যাশনাল পপুলাশান রেজিস্টার নির্মাণ ও বহাল করে, যার সাহায্যে দেশের জনগণের গতিবিধির উপর নজর রাখার ব্যবস্থাকে আরও বিস্তৃত করা যায়।

নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন বা সিটিজেনশিপ (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট (সিএএ) নাগরিকত্বের এই নতুন ধারণাকে আরও সম্প্রসারিত করে, এই উপমহাদেশে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্যতানির্ধারক হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করে। সিএএ ছয়টি অনথিভুক্ত অ-মুসলিম উৎপীড়িত ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী (হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টান) যারা ২০১৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর বা তার আগে পাকিস্তান, আফগানিস্থান ও বালাদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁদের নাগরিকত্ব প্রদান করে।

ধর্ম ও "সংখ্যালঘু"

নেহরুর রাষ্ট্রের ধারণা ধর্মকে নাগরিকত্ব পাওয়ার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা না করে, "সংখ্যালঘু" ও "সংখ্যাগুরু" – এই নিরপেক্ষ আখ্যাকে গ্রহণ করে। কিন্তু, যে ঘটনাবলীর ফলশ্রুতি দেশভাগ, তার অন্তর্নিহিত সংজ্ঞা ও তাৎপর্যের অস্পষ্টতাকে দেশভাগের সুতীব্র বাস্তবতা সামনে নিয়ে আসে। দেশভাগের কারণ যে বিভাজন, অর্থাৎ হিন্দু সংখ্যাগুরু ও মুসলিম সংখ্যালঘু, এই পৃথকীকরণের "স্বাভাবিক" নীতির পুনরাবৃত্তির বিপদের কথা মাথায় রেখে, ভারতীয় সংবিধান "সংখ্যালঘু" -এই আখ্যাটি ব্যবহার করে এবং তার ব্যাখ্যাকে অনির্ধারিত রাখে।

সংবিধানের ধারা ২৯ এবং ৩০ "সংখ্যালঘু" আখ্যার বিস্তারিত বর্ণনা করে না এবং তাকে ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং ভাষাগত সংখ্যালঘু – এই দুটি উপবিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করে। এই আখ্যাটির সংজ্ঞাকে উন্মুক্ত রাখার ফলে মৌলিক অধিকারের পরিকাঠামোটি অনেক বেশি বিস্তৃত হয়; সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ভাষাগত/সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পুনর্গঠনের উপর ভিত্তি করে, যে কোন রাজ্যের যে কোন গোষ্ঠীই সংখ্যালঘু হতে পারেন।

জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশন আইন বা ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটিজ অ্যাক্ট (এনসিএম), ১৯৯২, কোনও গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়কে উপস্থাপিত করে এবং মুসলিম, খৃস্টান, শিখ, বৌদ্ধ এবং জরাথ্রুস্ট্রীয় (পার্সি) – এই পাঁচটি গোষ্ঠীকে জাতীয় স্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করে। "কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার – দুইয়ের অধীনেই সংখ্যালঘুদের যে উন্নয়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার" জন্য সংখালঘুদের একটি জাতীয় কমিশন প্রতিষ্ঠা করাই এই আইনের উদ্দেশ্য ছিল। তবে, এই আইনটি ধর্মীয় পরিচয়কে সামাজিক গোষ্ঠীকে শনাক্ত করার এবং জাতীয় স্তরে তাদের প্রান্তিকীকরণের মাত্রা পরিমাপের আনুষ্ঠানিক চিহ্নক হিসেবে প্রতিষ্ঠা

করে। এই আইন সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুর সংজ্ঞা স্থির করে এবং ঘোষণা করে যে, হিন্দু ধর্মালবলম্বীরা ভারতের একমাত্র সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী। ধারা ২ (সি) সরকারের হাতে ধর্ম ও ভাষার ভিত্তিতে কোনও গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করার ক্ষমতা তুলে দেয়।

২০০৪ জাতীয় সংখ্যালঘু শিক্ষা সংগঠন আইন বা ন্যাশনাল কমিশন ফর মাইনরিটি এডুকেশনাল ইন্সটিট্যুট অ্যাক্ট (এনসিএমইআই) "সংখ্যালঘু" গোষ্ঠীকে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা প্রতিবেদিত ব্যাখ্যা অনুযায়ীই সংজ্ঞায়িত করে। সংবিধানের ধারা ৩০ যেমন সুযোগ দিয়েছে, নিজেদের পছন্দ মত শিক্ষা সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার অধিকার যাতে ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলির হাতে থাকে, তার ব্যবস্থা করাই এর উদ্দেশ্য ছিল। তবে, ভাষাগত সংখ্যালঘুদের এনসিএমইআই-এর আওতার বাইরেই রাখে এই আইনটি। ২০০৬ সালে মিনিস্ট্রি অফ সোশ্যাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট থেকে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ মাইনরিটি অ্যাফেয়ারকে আলাদাভাবে গঠন করা হয়। কিভাবে সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে একটি স্থায়ী আনুষ্ঠানিক পরিচয় দেওয়া হয়েছে এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের মর্ম সঙ্কুচিত হয়ে বহুভাষিক/আঞ্চলিক, বহু-জাতি এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিচয়ের সঙ্গে জড়িত ধর্মীয় অনুষঙ্গে পরিণত হয়েছে তা এই ক্রমবিকাশগুলি তুলে ধরে। তার উপর, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যাগত যোগ্যতাকেই একটি ধর্মীয় বা ভাষাগত গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার প্রধান সূচক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগটি সংখ্যালঘু মর্যাদা পাওয়ার শর্ত হিসেবে সমজাতিত্ব বা হোমোজেনিটির নীতিকে চাপিয়ে দেয়।

ভারতের মুসলিম গোষ্ঠীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং শিক্ষাগত অবস্থার বিষয়ে ২০০৬ সালের সাচার কমিশন রিপোর্টটি এই আইনি আলোচনায় পরিবর্তনের একটি কারণ। এই বিবৃতিটি মুসলিম ও অন্যান্য সামাজিক-ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে দেখায় যে, এদের মধ্যে প্রান্তিকীভবনের স্তরের মধ্যে বৈষম্য ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এই সমীক্ষাটি একটি যুক্তিনির্ভর ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিগত পন্থার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এর উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, বিশেষত মুসলিমধর্মাবলম্বীদের উন্নয়নের জন্য একটি গঠনমূলক ও সর্বাঙ্গীণ নীতিগত পরিকাঠামো নির্মাণ। তবে, এই বিবৃতিটি ধর্মীয় পরিচয়কে সরকারী নীতি ও সামাজিক গবেষণার পরিকাঠামোর অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা করে। এই বিবৃতিটি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্যের বৃহত্তর বিতর্ক থেকে শ্রেণীর ধারণাকে, বেশ বৈপ্লবিকভাবেই, প্রতিস্থাপন করে।

এই আইনী-প্রশাসনিক ভাষার কিছু অনস্বীকার্য প্রভাব পরবর্তীকালের রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়, বিশেষ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে। ২০১৪ সালে, বিজেপির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী নাজমা হেপতুল্লা একটি বিতর্ক তৈরি করেন এই বক্তব্য রেখে যে, "মুসলিমদের কোনভাবে সংখ্যালঘু হিসেবে কল্পনা করা দুঃসাধ্য" এবং পার্সীদের সংস্কৃতি ও অস্তিত্বই আসলে বিপদের মুখোমুখি হয়েছে। তাঁর এই বক্তব্যের কারণে, শিখ, পার্সী ও খৃস্টানদের মত অন্যান্য সংখ্যায় কম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী, ভারতের অর্থনীতির উন্নয়নে যাঁদের অবদান অনেক বেশি, তাঁদের তুলনায় বিশেষ অধিকার দাবি করার জন্য মুসলিম জনগোষ্ঠীকে সামাজিক মাধ্যমে অপমানের পালা শুরু হয়। ইসলাম-ভীতির এই প্রদর্শনীতে, একটি দ্রুতবর্ধমান এবং শীঘ্রই সংখ্যাগুরুতে পরিণত হবে এবং নিয়ন্ত্রণ না করলে তাঁরা হিন্দুদের দমন করবেন, এমন একটি গোষ্ঠী হিসেবে মুসলিমদের দেখান হতে থাকে।

দ্বিতীয় সম্ভাব্য বিপজ্জনকতর অগ্রগতিটি হল একজন সংখ্যালঘুর আইনী সংজ্ঞা নিয়ে বিবাদ এবং সরকারের হাতে সংখ্যালঘু মর্যাদা ঘোষণার ক্ষমতা। এনসিএম ও এনসিএমইআই আইনের বৈধতাকে প্রশ্ন করে সুপ্রিম কোর্টে দুটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এই আবেদনপত্রগুলি

দাবি করে যে, জাতীয়স্তরে ছয়টি ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করা হিন্দুদের জন্য বৈষম্যমূলক। ২০১১ সালের আদমসুমারি অনুযায়ী, লাক্ষাদ্বীপ, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, জম্মু ও কাশ্মীর, অরুণাচল প্রদেশ, মণিপুর এবং পাঞ্জাব – এই আটটি রাজ্যে হিন্দুরা লক্ষণীয়ভাবে সংখ্যালঘু। আবেদনকারীরা এই রাজ্যের ইহুদি, বাহাই এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যালঘু হিসেবে ঘোষণা করার দাবি করেছেন।

এই আইন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীদের চিহ্নিত ও বিজ্ঞাপিত করার জন্য কেন্দ্রের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে এই অভিযোগে, এনসিএমইআই আইনের ধারা ২(এফ)-টিকেও প্রশ্ন করা হয়েছে। সংবিধান সংখ্যালঘুদের যে মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করেছে সেগুলির জন্য এই আইনটিকে "স্পষ্টতই স্বেচ্ছাচারী, অযৌক্তিক এবং অপমানজনক" হিসেবে আবেদনকারী অভিহিত করেছেন। আবেদনকারীরা দাবি জানিয়েছেন যে, কেন্দ্র যেন "সংখ্যালঘু" আখ্যাটিকে সংজ্ঞায়িত করে এবং রাজ্য ও জেলাস্তরে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের চিহ্নিত করার নির্দেশিকা তৈরি করে। যদিও, সংখ্যালঘু কমিশন জানিয়েছে যে, জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোনও ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা রাজ্যের হাতেও আছে, কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে এখনও মামলা চলছে।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক ভূগোল

একটি জনগোষ্ঠীর নাগরিকত্ব এবং সংখ্যালঘু মর্যাদা নির্ধারণের বৈধ মানদণ্ড হিসেবে ধর্মীয় পরিচয়ের উত্থানের ঘটনাটি ভারতের ভৌগোলিক পরিসর ও জাতীয় পরিচয়ের কল্পনাকেও প্রভাবিত করেছে। নাগরিকত্ব নিয়ে বিতর্ক, বিশেষ করে সিএএ-পরবর্তী সময়ে, ভারতের ভৌগোলিক পরিসর নিয়ে বিতর্কের সুযোগকেও প্রসারিত করেছে, যা ধর্ম-অঞ্চলকেন্দ্রিক একটি কৌতুহলজনক রূপরেখা নির্মাণ করেছে। তিনটি মুসলিমপ্রধান প্রতিবেশী রাষ্ট্রের *অত্যাচারিত* অ-মুসলিম ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ভারতের *সম্ভাব্য নাগরিক* হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আদতে ভারত রাষ্ট্র, অ-মুসলিম, বিশেষত দক্ষিণ এশিয়ার হিন্দুদের জন্য, একটি *বিশুদ্ধ স্বদেশের* কথা কল্পনা করছে। অ-মুসলিম/হিন্দুদের স্বদেশ হিসেবে ভারতীয় অঞ্চলের এই পরিমার্জিত ধারণা *বৈচিত্রের মধ্যে একতার* যে কল্পনাটি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত, সেটিকেও অস্থির করে তোলে। ভারত রাষ্ট্র যে একটি বিতর্কিত পরিসর হিসেবে উত্থিত হচ্ছে, তার প্রাথমিক কারণ এক দেশ, এক সংস্কৃতি, এক ধর্মের কল্পনার উপর ভিত্তি করে নির্মিত রাষ্ট্রের আদত প্রাচীন ইউরোপীয় ধারণাটিতে পরিণত হতে ভারতের অক্ষমতা। অ-মুসলিম/হিন্দু স্বদেশ প্রতিষ্ঠার সযত্নে লালিত স্বপ্নটিকে জাতীয়, আঞ্চলিক এবং স্থানীয় স্তরে বাস্তবে পরিণত করার পথে মুসলিমদের স্থানভিত্তিক উপস্থিতি একটি চিরস্থায়ী প্রতিবন্ধকতায় পরিণত হচ্ছে।

ধর্মকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু-সংখ্যাগুরু বিতর্ক, অন্যদিক থেকে দেখলে, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যাগত শক্তির প্রশ্নটি তুলে ধরে। এই পরিকাঠামোতে হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা জাতীয় পরিচয়ের অনস্বীকার্য দাবিদার হয়ে উঠবে, এবং তার সহজতম কারণটি হল এই গোষ্ঠীটি ধর্মীয় দিক থেকে দেশের সংখ্যাগুরু। অন্যদিকে, মুসলিমরা দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীতে পরিণত হবেন – যাঁদের চিরকালই বিপজ্জনক হিসেবে দেখা হবে। সেই ভাবে দেখলে, যে ভৌগোলিক পরিসর মুসলিমদের অধিকারে তাকে ক্রমশ চিরবিবাদমান পরিসর হিসেবে চিহ্নিত হতেই হবে।

বিজেপি, যা কিনা জন সংঘের একটি প্রবল সক্রিয় সংস্করণ, তার জাতীয় রাজনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হিসেবে উত্থান এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট উপাদান। যদিও, হিন্দুত্ব রাজনীতির সাফল্যকে সংকুচিত করে, কেবলমাত্র তার আপাত আদর্শগত গ্রহণযোগ্যতাতে পর্যবসিত করা যায় না। ধর্মকে কেন্দ্র করে যে চিরপরিবর্তনশীল বিতর্কটি চলে, বিজেপি তা আত্মস্থ করেছে, এবং তার সঙ্গে সঙ্গেই, এই রাজনৈতিক দলটি হিন্দু ভাবের একমাত্র প্রতিনিধি বলে জাতীয় স্তরে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার ফলে, "হিন্দু ভোট ব্যাঙ্ক", "হিন্দু নির্বাচনী এলাকা", এবং "হিন্দু পরিসর" – এই শব্দগুচ্ছগুলি ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নতুন রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে উঠে এসেছে।

নাজিমা পারভিন পলিসি পার্সপেকটিভ ফাউন্ডেশানের অ্যাসোসিয়েট রিসার্চ ফেলো এবং ক্রিয়া বিশ্ববিদ্যায়ের পোস্ট-ডক্টরাল ফেলো। তিনি *কন্টেস্টেড হোমল্যান্ডঃ পলিটিক্স অফ স্পেস অ্যান্ড আইডেন্টিটি (ব্লুমসবেরি, ২০২০)* বইটির লেখক।